জয়া-র 'হন্যমান'-প্রথম নয়

জয়া মিত্রের 'হন্যমান-কে সূত্র করে প্রদ্যুম্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলখানা-সংক্রান্ত নিবন্ধে ('যোগসূত্র', এপ্রিল-জুন, ৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত) মিশেল ফুকো—রণজিৎ গুহ যুগলবন্দী ছকে বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে ভিন্ন স্বাদ এনেছে ও ফলে নিবন্ধটি বেশ সুখপাঠ্য হয়েছে। এক অর্থে মানবিক অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের কাছে লেখাটি অবশ্যই প্রয়োজনীয়। 'হন্যমান'-এর কৃতিত্ব এখানেই যে প্রদ্যুম্নের মতো মানুষের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাকে নাড়িয়ে দিয়েছে, নানা ধরাবাঁধা তত্ত্ব ও অভ্যাসে চিড় ধরিয়েছে ; ভদ্র নাগরিক সমাজের প্রতি প্রদ্যুম্নের ঘৃণাকে তীব্র করতে সাহায্য করেছে।

কিন্তু শুধু প্রশংসার খাতিরে এই চিঠির অবতারণা নয় ; আপত্তি, অনুযোগ ও প্রশ্ন আছে বলেই এই পত্র প্রেরণ।

আপত্তি প্রদ্যুম্নের একটি দাবি নিয়ে : 'হন্যমান' সর্বপ্রথম জেলখানার 'এক অচেনা জগতের এক অনাবিষ্কৃত জগতের' মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করায়, চমকিত করে। প্রদ্যুম্নের কাছে তা প্রথম হলেও অন্যান্যদের কাছে তাই কি ? হন্যমানের প্রকাশকাল ১৯৮৯ সালের নভেম্বর। তারও দশ বছর আগে 'সত্তর দশকের বিপ্লবী রাজনীতির সক্রিয় কর্মী,' জয়া মিত্রের বান্ধবী, মীনাক্ষী সেনের (কখনো-কখনো অনামিকা রায়-চৌধুরী নামে) ধারাবাহিক ভাবে লেখা 'জেলখানার চালচিত্র' ('স্পন্দন'-এ প্রকাশিত) আমাদের কাছে সর্বপ্রথম জেলখানার স্মৃতির ভিন্ন স্বাদ নিয়ে আসে। সেই লেখার কোনো উল্লেখ নেই দেখে (এমনকি পাদটীকাতেও) পাঠক ধারণা করে নিতে পারেন যে, 'হন্যমান' ৯১ সালে (প্রকাশেরও দু-বছর বাদে) ভদ্র নাগরিক সমাজের 'দর্পণ' আনন্দবাজারে প্রকাশিত ও পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার পরই প্রদ্যুম্নকে সজাগ করেছে। সত্যিই বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রাজনীতি সচেতন' ম্যাগাজিন 'স্পন্দন'-এ প্রকাশিত মীনাক্ষীর লেখাগুলো প্রদ্যুম্নের নজর এড়িয়ে গেছে। নতুবা, হয়ত আমরা অনেক আগেই প্রদ্যুম্নের কাছ থেকে এই ধরনের চিন্তাকর্ষক প্রবন্ধ আশা করতাম।

'পাগলাগারদ' অংশে প্রদ্যুম্ন সঠিক ভাবেই জানাচ্ছেন যে, পাগল ভবঘুরে প্রভৃতিদের জেলখানায় পাঠানোর ক্ষেত্রে ব্রিটিশরাই 'পথিকৃৎ' এবং সেই ঐতিহ্য এখনও চলছে। ১৯৪৭ পরবর্তী ভারতে 'চোর, খুনী, পাগলা ও পতিতা মেয়েদের কথা' তুলে ধরেছেন চিত্র-পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের স্ত্রী সুরমা ঘটক। তাঁর বইটি 'শিলং জেলের ডায়েরী' সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত (১৯৯১ সালের এপ্রিলে)। এই বইয়ে শ্রীমতী ঘটক 'রাজনৈতিক' বন্দিনী' হিসাবে প্রায় দু-বছর (১৯৪৯ সালের ৩১শে অক্টোবর থেকে ১৯৫১ সালের ২৯শে জুন পর্যন্ত) থাকার অভিজ্ঞতা বর্ণনার মাধ্যমে সদ্য 'স্বাধীন' ভারতীয় রাষ্ট্রের জেলের 'অন্য জগতের মানুষদের' সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অবশ্যই তাঁর লেখা মীনাক্ষী বা জয়া মিত্রের মতো অত গোছালো নয়,

কিছুটা অসংলগ্ন। তবু আবেদন রয়েছে লেখাটিতে। ঋত্বিকের কথায়, এ লেখার নতুনত্ব আছে। বিশেষ করে মেয়েদের [Tribal মেয়েগুলো, ঐ Lumpenised পাগলগুলো, ঐ বারবণিতার দল' ···] বেরিয়ে আসার দিক, তাদের বন্দী-জীবনের সমস্যা, তাদের সমাজ জীবনের সমস্যা' (পৃঃ ১১০-১১১)। বইটি যদি প্রদ্যুম্নের নজর না এড়িয়ে যেত তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর চোখে ধরা পড়ত জেলখানার অন্য জগত সম্পর্কে এক ইতিবৃত্ত।

শুধু তাই নয়, সুরমা ঘটকের বইয়ের আর একটি বিষয় প্রদ্যুম্নের সতর্কদৃষ্টি নিশ্চয়ই এড়াত না। একদিকে রাজনৈতিক বন্দিনী হিসাবে 'উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিতে' শ্রীমতী ঘটক এইসব সাধারণ অপরাধী মেয়েদের দেখছেন, আন্তরিক ভাবে 'জানবার চিনবার ও বুঝবার' চেষ্টা করছেন, তেমনই অন্যদিকে 'জেলখানার অন্যদের চিৎকার, অশালীন আচরণে' মাঝে-মাঝে তিতিবিরক্ত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করছেন (পৃষ্ঠা ৪৪)। এই টানা-পোড়েন—'অন্যদের' সঙ্গে মেলামেশা করা, তাদের পরিবর্তন করার চেষ্টা, তাদের নিয়ে ন্যায্য দাবির সপক্ষে সংগ্রাম চালানো, আবার মাঝে-মাঝে 'ভদ্রসমাজ সুলভ' তীব্র অনুভূতি—অশালীন, নীচু জাতের মেয়েদের প্রতি বিচ্ছিন্নতা, বিযুক্ত হওয়ার মানসিকতা—চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে শ্রীমতী ঘটকের রচনায়।

তাই তিনটি রচনা ফুকো-গুহ ছকে আলোচনা করলে আলোচনা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠত এবং এমন দাবি অন্তত উঠত না যে, শুধু জয়া মিত্রের 'হনামান' সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত অন্যান্য জেল বৃত্তান্ত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

অনুযোগ :

'নাগরিক সমাজের একাংশ রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি হওয়ার পরেই নিশ্চিন্ত হয়'—মন্তব্যটি উক্ত একাংশের প্রতি অবিচার। কারণ প্রদ্যুম্নের স্মৃতি যদি এখনও ধূসর না হয়ে যায়, তাহলে মনে থাকতে পারে যে, ১৯৮৬-৮৭ সাল থেকেই নিরপরাধ বন্দিনী নির্যাতিতা মানসিক বন্দিনী (NCL) ও সাধারণ কয়েদীদের নিয়ে 'একাংশ' শুধু প্রচার করেনি, সাধ্যানুযায়ী আন্দোলনও করেছে, বহুজনকে মুক্তির স্বাদ দিতে পেরেছে ও পুনর্বাসন দিতে পেরেছে এবং সাধারণ কয়েদীদের উপর জেলখানায় নির্যাতন বন্ধের ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য নানা প্রক্রিয়ায় তারা আজও যুক্ত। আসলে, শেষ বিচারে, প্রদ্যুম্ন তো সেই ভদ্রসমাজেরই একজন। দুর্ভাগ্য, 'একাংশের' প্রচেষ্টা যেহেতু ভদ্রসমাজের প্রচার মাধ্যমে স্থান পায় না, প্রদ্যুম্ন তাই জানতে পারেন না সেই প্রচেষ্টার কথা।

দুটি প্রশ্ন ব্যাখ্যাসহ :

এক : 'হনামান' পাঠ করে প্রদ্যুম্নের রাজনৈতিক-সাধারণ বন্দীদের বিভাজন রেখা টানার দৃঢ়প্রত্যয়ী অভ্যেসে ভাঁটার টান লাগে, প্রচলিত ধারণায় আসে সন্দেহ? কেন? সাধারণ বন্দীদের প্রতিরোধেরও দৈনন্দিন কর্মসূচী আছে বলেই বিভাজন টানা যায় না? এ ধরনের সিদ্ধান্ত কি হাস্যকর নয়? জয়া মিত্র, মীনাক্ষী সেন,

সুরমা ঘটক বা আজিজুল হকরা ছিলেন রাজনৈতিক বন্দী। তাঁদের চেতনায় (যতই তা রণজিৎ গুহ ছকে উচ্চবর্গীয় হোক না কেন) ধরা পড়েছে অন্য জগত, লেখায় ফুটে উঠেছে তারই ছবি। প্রদ্যুম্নও চিনছেন, চমকিত হচ্ছেন 'রাজনীতি সচেতন', 'সমাজ-সচেতন' বন্দীদের চশমা পরেই। সাধারণ কয়েদীদের প্রতিরোধ ক্ষণিক, (তার মানে এই নয় যে, পরিকল্পনাবিহীন); দিশা অসম্পূর্ণ। অন্যদিকে সুরমা ঘটকরা 'অন্যদের' বোঝানোর চেষ্টা করেন রাষ্ট্রকাঠামোর টানাপোড়েন, প্রকৃত মুক্তির কথা ভাবেন উন্নততর মানবিক সমাজজীবনের মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ভিন্ন-ভিন্ন রূপকে চেনা, প্রতিরোধের নানা স্তর ও উত্তরণের প্রশ্ন সম্যক ধারণার বিচারে রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে সাধারণ বন্দীদের ফারাক আছেই। রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে সাধারণ কয়েদীদের প্রতিরোধের স্তরে মেলবন্ধন হওয়ার অর্থ কখনোই এটা নয় যে তাদের মধ্যে বিভাজনরেখা টানা অসম্ভব।

দুই : প্রদ্যুম্ন কি মনে করেন এই বিভাজন রাষ্ট্রের দাক্ষিণ্যে প্রাপ্ত? অথবা এই বিভাজন, স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বহু সংগ্রামের ফল? আসলে, প্রদ্যুম্ন রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে সাধারণ কয়েদীদের সুসম্পর্ক ও যৌথ প্রতিরোধের কাহিনী পড়ে অন্য একটি সম্পর্কের দিকে খেয়াল করেননি—রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীর সম্পর্ক। রাষ্ট্র সমস্ত বন্দীকেই 'সাধারণ অপরাধী' হিসাবে দেখে; রাষ্ট্র চায় রাজনৈতিক বিরোধীদের রাজনৈতিক মতাদর্শকে অস্বীকার করে তাকে সাধারণ অপরাধীদের স্তরে নামিয়ে আনতে, তার ব্যক্তিসত্তাকে চরম অবমাননা করতে। রাষ্ট্রের আনুগত্যের ও কর্তৃত্বের বিরোধিতার অর্থই 'রাজদণ্ড' : যার আধুনিক কাঠামোগত ব্যবস্থা হল জেল, প্রদ্যুম্ন মিশেল ফুকো থেকে মনুসংহিতার উদাহরণ টেনে আমাদের বুঝিয়েছেন। এবং তাই যদি হয়, তাহলে রাজনৈতিক কয়েদীর জেলের অভ্যন্তরে তাঁর রাজনৈতিক সত্তার দাবি, মর্যাদা আদায়ের সংগ্রাম বা স্বীকৃতি রণজিৎ গুহ বিবৃত ছক অনুসারে কেন কর্তৃত্ব-আনুগত্য দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ভাঙার যথাযথ দৃষ্টান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে না? রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দাবির দীর্ঘ সংগ্রাম কেন রাষ্ট্রকর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া বিধিনিষেধের ও মতাদর্শের পাল্টা ক্ষমতা জাহিরের, পাল্টা মতাদর্শ স্থাপনের, নাগরিক তথা মানবিক সত্তার বিকশিত হওয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নজির হবে না? রাষ্ট্র যখন 'ভয়ঙ্কর' রাজনৈতিক বিরোধীদের নাম ধাম, গোত্র, ব্যক্তিহীন একটি বিশেষ বর্গে রূপান্তরিত করে (যেমন, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, আসাম, অন্ধ্র প্রদেশ, পশ্চিমবাংলা-সহ সর্বত্র সশস্ত্র পথে বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মীকে 'জঙ্গি, 'সন্ত্রাসবাদী' 'উগ্রপন্থী' 'আতঙ্কবাদী, ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা) ও অনায়াসেই প্রচার চালায় 'অজ্ঞাতপরিচয় নকশালপন্থী বা উগ্রপন্থী' নিহত সাজানো সংঘর্ষে। তখন সেই বর্গ ভেঙে প্রত্যেকটি ব্যক্তির পরিচয় দেওয়া, তার সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করা, রাষ্ট্রের সংজ্ঞার্থ অস্বীকার করে রাজনৈতিক কর্মীর রক্তমাংসের রূপ দেওয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বিশেষ অঙ্গ। দুর্ভাগ্য আমাদের যে, রাষ্ট্র-মাধ্যম এতদূর সফল এই প্রচারে যে রাষ্ট্র কাঠামোর তীব্র বিরোধী প্রদ্যুম্ন অবশেষে রাষ্ট্রের

প্রচারের ফাঁদে পা দেন : বিভাজন রেখার দুঃপ্রত্যয়ী অভ্যাসে ভাঁটা এনে, সন্দেহ পোষণ করে। রাষ্ট্র তো এটাই চায়—রাষ্ট্র-বিরোধীরাও যাতে যেন-তেন প্রকারেণ রাজনৈতিক বন্দীদের 'ক্রিমিন্যাল' গোত্রভুক্ত হিসাবে ভাবে, বিবেচনা করে ; সে ভাবনা ফুকো-গুহ ছক ধরে এলেও তাদের অবশ্য আপত্তি নেই। কার্যসিদ্ধিই রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র।

সুজাত ভদ্র
কলকাতা-১০

নাগরিক উদাসীনতাকেই আঘাত করতে চেয়েছি

সুজাত ভদ্র আমার লেখা ('জেলখানা আর জেলখানার অন্যেরা', যোগসূত্র, এপ্রিল-জুন, ১৯৯২) পড়ে নানা আপত্তি, অনুযোগ আর প্রশ্ন তুলেছেন। সাধ্যমত আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

সুজাত আমার লেখাকে 'ফুকো-গুহ ছকে' বিশ্লেষণ বলেছেন। মিশেল ফুকো বা রণজিৎ গুহর বিভিন্ন লেখার ছাপ নিশ্চয়ই আমার লেখায় পড়েছে। রাষ্ট্র, তার জেল-জরিমানা ইত্যাদি প্রসঙ্গে যে কোনো আলোচনা আজকের দিনে বোধহয় ফুকোর দিক-নির্দেশী বিশ্লেষণ ছাড়া সম্ভব নয়। আবার গুহর এদেশের রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবন নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নানা লেখার প্রভাবও আমার ওপর সক্রিয়ভাবে পড়েছে। আর শুধু গুহই বা কেন? গুহর সহযোগী 'সাব অলটার্ন' লেখকগোষ্ঠীর অনেক লেখাই, বিশেষ করে গৌতম ভদ্রের ভোজপুরের কৃষক প্রতিরোধের ঐতিহ্য নিয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নিম্নবর্গের মানুষজনের ওপর রাষ্ট্র এবং তার সহায়ক ক্ষমতাবানদের দাপট এবং তার বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের মানুষজনের দৈনন্দিন প্রতিরোধের নানা দিকের তাত্ত্বিক হদিস দিয়েছেন জেমস স্কট এবং তাঁর সহযোগীরা।[১] পছন্দমতো এর মধ্যে থেকে সচেতনভাবে 'ছক' ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজটি আমি করেছি। পছন্দসই নানা তাত্ত্বিক ছক বেছে নেবার পেছনে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চাপও খানিকটা ছিল। আবেগের ব্যাপারটাও অস্বীকার করতে পারি না। রাষ্ট্রশক্তি আর তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ক্ষমতাবানদের ভীতিপ্রদ অস্তিত্বের মুখোমুখি হওয়া এক সাধারণ অভিজ্ঞতা। এই সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা নানা অন্যায়, অবিচার এবং এগুলির প্রতি 'ভদ্র নাগরিক সমাজের' (আমি নিজেও যার মধ্যে পড়ি) ঔদাসীন্য আর নির্বিকারে মেনে চলাকে আঘাত দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল। আর এই উদ্দেশ্যসাধনেই এই সমস্ত তাত্ত্বিক ছকের দ্বারস্থ হওয়া।

আমি আমার লেখার কোথাও 'হন্যমান'কে 'অচেনা জগতের' হদিস দেবার ব্যাপারে সর্বপ্রথম' বলে দাবি করিনি। 'হন্যমান' পড়ে আমার যে অনুভূতি তাই আমি আমার লেখায় বলার চেষ্টা করেছি। মীনাক্ষী সেনের 'জেলখানার চালচিত্র' অথবা সুরমা ঘটকের 'শিলং জেলের ডায়েরী' পড়ার সুযোগ আমার হয়নি স্বীকার করছি। এ দুটির কথা জানানোর জন্যে সুজাত-কে ধন্যবাদ। জেলখানার 'অন্যদের', বিশেষ করে মেয়েদের নিয়ে লেখা হয়ত আরও আছে। তবে প্রয়োজনটা হচ্ছে তাদের সম্পর্কে আমাদের অপরিচিতির যে অভ্যাস তাকে কাটিয়ে উঠে, তাদের কণ্ঠস্বর, তাদের একান্ত নিজস্ব জগত, তাদের বেঁচে থাকা, প্রতিরোধের কায়দা ইত্যাদি গুরুত্ব সহকারে বোঝা। আর এই ব্যাপারে 'হন্যমান' যে অনবদ্য সেটা নিশ্চয়ই সুজাত স্বীকার করবেন।

সুজাত তাঁর পত্রে অনুযোগ জানাচ্ছেন যে 'নাগরিক সমাজের একাংশ রাজনৈতিক

বন্দীমুক্তি হওয়ার পরেই নিশ্চিন্ত হয়', আমার এই মন্তব্য 'উক্ত একাংশের প্রতি অবিচার'। কিন্তু আমি কি তাই বলেছি? আমি বলেছি, 'রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে বন্দীমুক্তি আন্দোলনও শুরু হয়। নাগরিক সমাজের একাংশ এই আন্দোলনে সামিলও হয়। আন্দোলনের চাপে সরকার বাধ্য হয় এই দাবি মেনে নিতে। সরকার বাহবা পায়, নাগরিকরাও নিশ্চিন্ত হয়'। আমার লক্ষ্য কিন্তু 'নাগরিক সমাজের একাংশ' নয়। আমার লক্ষ্য ছিল বৃহত্তর ভদ্র নাগরিক-সমাজ যাঁরা সব অবস্থাতেই দিব্যি ভাল থাকেন এক আশ্চর্য নির্বিকার ভাব অবলম্বন করে। সব কিছুকে 'স্বাভাবিক' ধরে নিয়ে নাগরিকদের এই ঔদাসীন্যকে আঘাত দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য।

আর 'নাগরিক সমাজের একাংশের' প্রচেষ্টার কথা আমরা জানি। দীর্ঘদিন ধরেই নিরাপরাধ বন্দিনী, নির্যাতিতা মানসিক বন্দিনী আর সাধারণ অপরাধীদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে তাঁরা সক্রিয় রয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন করে সাফল্যও লাভ করেছেন। থানার লক-আপে পুলিসি অত্যাচার, মৃত্যু ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাঁরা প্রচার চালিয়েছেন, এই সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য-সংক্রান্ত পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। এবং 'নাগরিক সমাজের একাংশ' কর্তৃক সংগৃহীত এই সমস্ত তথ্যের গুরুত্ব এত বেশি যে ভদ্র নাগরিক সমাজের প্রচার মাধ্যমও এগুলিকে উপেক্ষা করতে পারে না। প্রচারমাধ্যমগুলিতে প্রকাশিত মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত প্রতিবেদনে 'নাগরিক সমাজের একাংশের' নানা প্রচেষ্টার কথা তাই নজরে পড়ে। খুব সম্প্রতি এ রাজ্যের মানবাধিকার সংক্রান্ত সরকারি সভায় 'একাংশের' প্রতিবাদী ভূমিকার কথাও সেখানে পেয়েছি।[২]

দুটি প্রশ্ন আর আমার বক্তব্য :

আমি আমাদের লেখায় 'রাজনৈতিক বন্দী' আর 'সাধারণ অপরাধীদের' মধ্যে বিভাজন রেখা টানার দৃঢ়প্রত্যয়ী অভ্যেসে ভাঙনের কথা বলেছি। এবং সুজাত আমার এই বক্তব্যকে 'হাস্যকর' বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর প্রশ্ন, সাধারণ বন্দীদের প্রতিরোধের দৈনন্দিন কর্মসূচী আছে বলেই কি এই বিভাজন রেখা টানা যায় না। আসলে আমার এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখানো যে সাধারণ অপরাধী, বিশেষ করে যাদের কথা জয়া মিত্র তাঁর বইতে বলেছেন তাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপও বাইরে সামাজিক-পারিবারিক জীবনে আর জেলের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ ইত্যাদি অন্য আরেক ধরনের রাজনীতির ইঙ্গিত দেয়। কারণ, এ পোড়া দেশে কোনোরকমে বেঁচে-বর্তে থাকার তাগিদ বা একান্ত আপনার কিছুকে বুকে আঁকড়ে ধরতে সচেষ্ট মানুষজনের 'অপরাধ' কি ক্ষমতার নানা দাপটের বিরুদ্ধে আরেক ধরনের প্রতিরোধ নয়? সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে রাষ্ট্র, জেল-জরিমানা, সামাজিক বিধিনিষেধের ভয় থাকে, থাকে শাসকগোষ্ঠীর পছন্দমাফিক। নিম্নবর্গের মানুষজনকে গড়ে-পিটে নেবার নানা মতাদর্শগত আয়োজন। এত কিছু বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও এই সব মানুষ একান্ত নিজস্ব কায়দায় তার মুখোমুখি হয়, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় তারা তাদের আশপাশের জগত আর তাদের জীবন,

চিন্তাভাবনার ওপর খবরদারি করা ক্ষমতাবানদের বোঝে, প্রতিবাদ করে। আধিপত্য প্রতিরোধের এই সম্পর্ককে কি 'রাজনৈতিক' বলা যাবে না? ভদ্র নাগরিক-সমাজের কাছে 'রাজনৈতিক' বললেই একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিরই ছবি ফুটে ওঠে, নির্দিষ্ট সংগঠন আর কর্মসূচী যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই পরিচিত ক্ষেত্রের বাইরে 'অন্য রাজনীতি'র গোপন প্লাবনের কথাই আমি বলতে চেয়েছি।

সুজাত বলেছেন, 'সাধারণ কয়েদীদের প্রতিরোধ ক্ষণিক, দিশা অসম্পূর্ণ।' আর এই-খানেই সুরমা ঘটকদের প্রয়োজন যাঁরা 'অন্যদের' রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নানা চেহারাকে চেনান প্রকৃত মুক্তির কথা ভাবেন উন্নততর মানবিক সমাজজীবনের মধ্য দিয়ে। তা 'অন্যদের' প্রতিরোধ কি ক্ষণিক? নিশ্ছিদ্র সন্ত্রাসের আবহাওয়ার মধ্যেও কিন্তু তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে একান্ত নিজস্ব কায়দায়, লেখিকা তাঁর বিবরণ দিয়েছেন। জেলের নিয়মকানুন ভাঙা, কর্তৃপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করা, গুনতিতে বাধা দেওয়া, গরাদে প্রবেশ করতে অবাধ্য হওয়া, জেলের কর্তাব্যক্তি আর তাদের সহযোগীদের গালাগালি দেওয়া, তাদের ব্যঙ্গ করা, হই-হট্টগোল করা দৈনিক প্রতিরোধের অঙ্গ। দৈনন্দিন এই প্রতিরোধ আমাদের নজর এড়িয়ে গেলেও, এই ধরনের প্রতিরোধ তাদের বেঁচে থাকার শর্ত, ক্ষমতার দাপটের বিরুদ্ধে এ যেন তাদের পাল্টা এক মূল্যবোধ।[৩]

আসলে এই ধরনের প্রতিরোধ অধিকাংশ সময়েই থাকে অঘোষিত। জেলখানার ভিতরে (বাইরেও) নিরন্তর সন্ত্রাসের আওতায় এই 'নিস্তব্ধ' প্রতিরোধ বোধহয় 'অন্যদের' কাছে সাময়িক মুক্তির আস্বাদ এনে দেয়। রাষ্ট্রক্ষমতা আর তার সহযোগী নানা শাসক-গোষ্ঠীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সরাসরি তার মোকাবিলা করার জায়গায় হয়ত তারা সব সময় থাকে না, তাই অন্তর্বর্তী অবস্থায় তারা বেছে নেয় এই ধরনের প্রতিরোধ মাধ্যম। এই অজানা দিকের প্রতি নজর সম্পর্কে গবেষকেরা দিয়েছেন, গ্রামশ্চীর লেখাতেও আমরা এর ইঙ্গিত পেয়েছি। নিম্নবর্গের মানুষজন যে সাধারণত নিজেদের জীইয়ে রাখতেই অভ্যস্ত তার উল্লেখ করেছেন তিনি।[৪] আর নিজেদের জীইয়ে রাখতেই তারা গ্রহণ করে নানা পন্থা, সচেতনভাবে। রাষ্ট্র এবং তার সঙ্গে যুক্ত ক্ষমতাবানরা নিম্নবর্গের আনুগত্য আদায় করতে গিয়ে মতাদর্শগত আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে দমনপীড়নের নানা পন্থা, উদ্দেশ্য তাদের বশ্যতা আদায় করা। দুর্দমনীয়, অবাধ্য আর সক্রিয় বিরোধীরাই যে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় দমনপীড়নের শিকার হয় তা নয়, 'নিষ্ক্রিয়' থেকেও যারা বিরোধিতা করে তারাও এর হাত থেকে রেহাই পায় না।[৫] জেলের অভ্যন্তরে বন্দীদের সক্রিয় প্রতিরোধের পাশাপাশি 'নিষ্ক্রিয়' প্রতিরোধের নানা নিদর্শন আমরা পেয়েছি। আমরা দেখেছি কীভাবে তারা ছোটখাট নানা প্রতিরোধ গড়ে তুলে নিজেদের অস্তিত্ব জীইয়ে রাখে। অধিকাংশ সময়ই এর কোনো খবর মেলে না। তাই 'অন্যদের' প্রতিরোধকে 'ক্ষণিক' বলাটা বোধ হয় অনুচিত। তাদের প্রতি সুবিচার দেখাতে গেলে বোধ হয়— অজানা 'নিস্তরঙ্গ' প্রতিরোধের দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। কারণ তাদের জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম।[৬]

তবে এই দৈনন্দিন প্রতিরোধের ধারাকে আদর্শায়িত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এখানেও হার-জিত আছে, টানাপোড়েন আছে। প্রচলিত ব্যবস্থায় বিরাট কিছু পরিবর্তনও এর ফলে হয়ত ঘটে না। 'অন্যেরা' অনেক সময় নিজেদের মধ্যেও নানা সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে, 'হনুমানে' আমরা পাচ্ছিও তার বিবরণ। 'ঘর মুছবার সময় কেউ বসে আছে বলে, তার চারিদিক দিয়ে ঘুরিয়ে মুছে নিলে মাথা ফাটাফাটি পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। ও রকম ঘেরা দিলে নাকি সে আর ঘেরার ভেতর থেকে বের হতে পারবে না কোন দিন' (পৃ. ২৫)। আবার তারাই জেল কর্তৃপক্ষের লোকজনকে ব্যতিব্যস্ত করে তাদের অত্যাচারকে প্রতিহত করে। এই সমস্ত ছোটখাট প্রতিরোধের ঘটনার মধ্যেই 'ক্ষণিক' 'বড় বড় ঘটনা' ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

সুজাত বলছেন 'সাধারণ কয়েদীদের দিশা অসম্পূর্ণ'। আর সেই দিশা সম্পূর্ণ করেন 'রাজনৈতিক কর্মীরা' যাঁরা 'অন্যদের' রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নানা চেহারা আর টানা-পোড়েন সম্যকরূপে অবহিত করেন। 'প্রকৃত মুক্তির কথা ভাবেন উন্নততর মানবিক সমাজ জীবনের মধ্য দিয়ে'। আসলে সুজাতর কাছে 'সম্পূর্ণ' আর যথাযথ প্রতিরোধ হচ্ছে একমাত্র সেই সমস্ত যেগুলির পেছনে থাকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, তত্ত্ব এবং উত্তরণের দিশা। আর এর বাইরে 'অন্যদের' যাবতীয় প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় এতকাণ্ডের হিসাব না পেয়ে সুজাতর কাছে তা হয়ে দাঁড়ায় 'অসম্পূর্ণ' ফলে 'প্রকৃত মুক্তি' থেকে তা পড়ে থাকে অনেক দূরে। এই দিক দিয়ে বিচার করেই সুজাত 'সাধারণবন্দী' আর 'রাজনৈতিক বন্দীদের' মধ্যে বিভাজন রেখা টানেন। আসলে পুরনো কমিউনিস্ট পার্টির ধারণায় বিভোর হয়েই সুজাত 'অগ্রগামী কর্মী' আর 'অসম্পূর্ণ দিশাগ্রস্ত' 'অন্যদের' মধ্যে স্তর ভেদ (hierarchy) রাখছেন। এমন স্তর ভেদের কি কোনো প্রয়োজন আছে? মার্কসীয় তত্ত্বের মধ্যেই তো 'রাজনৈতিক কর্মীদের' এমত 'অগ্রগামী' অবস্থান নিয়ে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।[৭] আর তাছাড়া বাস্তবে 'অন্যদের' প্রতিরোধও তো হাজারো রকমের, তার রূপও বিচিত্র। এগুলি যে কেতাবি বিধিবদ্ধ তত্ত্বের নিয়মমাফিক অথবা সুজাত কথিত 'সম্পূর্ণ' হবে তারও কোনো মানে নেই। আর তা বোধহয় কস্মিন-কালেও হয় না। মনোমত না হলেই যে তা 'অসম্পূর্ণ' তা বোধহয় নয়। এই 'অন্য' অজানা বিচিত্র প্রতিরোধের নানা ঘটনার—মধ্যেই তত্ত্ব মিলে-মিশে একাকার হয়, সজীব হয়ে ওঠে।[৮]

সুজাত তাঁর পত্রের শেষের দিকে মন্তব্য করেছেন যে আমি রাষ্ট্রের সঙ্গে 'রাজনৈতিক বন্দীর সম্পর্ক খেয়াল করিনি। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য: রাষ্ট্র রাজনৈতিক বিরোধীদের রাজনৈতিক মতাদর্শকে অস্বীকার করে তাকে সাধারণ অপরাধীর স্তরে নামিয়ে আনে, তার ব্যক্তিসত্তাকে অবমাননা করে। এবং অন্যদিকে 'সশস্ত্র পথে বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মীকে রাষ্ট্র 'জঙ্গি' 'উগ্রপন্থী' ইত্যাদি বর্গে রূপান্তরিত করে তাকে নিশ্চিহ্ন করে। তাই সুজাতর প্রশ্ন—জেলের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক বিরোধীদের রাজনৈতিক সত্তার দাবি, মর্যাদা আদায়ের সংগ্রাম রাষ্ট্রকর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া বিধিনিষেধের আর মতাদর্শের পাল্টা ক্ষমতা

জাহিরের, পাল্টা মতাদর্শ স্থাপনের নজির হবে না ? অথবা 'জঙ্গি' 'উগ্রপন্থী' ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় বর্গ ভেঙে রাজনৈতিক কর্মীর আসল পরিচয় বার করার প্রচেষ্টাওতো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এক বিশেষ ধরন ? তিনি সঠিকভাবেই বলেছেন যে রাষ্ট্র রাজনৈতিক বিরোধীদের মতাদর্শকে অস্বীকার করে তাদের মানবিক সত্তাকে অবমাননা করে। এই সমস্ত ঘটনা মোটামুটি আমরা জানি, নতুন করে তোলারও কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমার লেখায় এগুলি বলার সুযোগও নেই কারণ আমার আলোচনা প্রধানত 'হনুমানে' বর্ণিত জেলখানার 'অন্যদের' নিয়ে। এবং আমার বক্তব্য ছিল রাষ্ট্র এই ব্যাপারটা 'অন্যদের' ক্ষেত্রেও ঘটায়। লেখার মধ্যে তার ইঙ্গিতও খানিকটা ছিল। রাষ্ট্র আর তার আইনের চোখে 'অপরাধ' হচ্ছে এক ধরনের অসুস্থতা, 'স্বাভাবিক মানসিকতা' থেকে এক ধরনের বিচ্যুতি। ইতোয়ারী, জায়দা, কমলা, বরদা এরকম আরও অনেককেই রাষ্ট্র নানা আইন আর 'কেসের' তাৎক্ষণিক ছকে ফেলে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে জেলবন্দী করে। চরম দমনপীড়ন চালানো হয় তাদের ওপর, তাদের মানবিক সত্তারও চরম অপমান করা হয়, উদ্দেশ্য, রাষ্ট্রীয় আইন ভাঙার বিপদজনক, বেহিসেবি প্রবণতাকে নির্মূল করা। নানা কেস আর ধারায় ফেলা হয় তাদের, নিজেদের মানবিক পরিচয় হারিয়ে তারা পরিণত হয় কিছু শীতল তথ্যে আর ফাইল নাম্বারে। আর এই সমস্ত তথ্যের চাপে হারিয়ে যায় 'অন্যদের' দৈনন্দিন জীবন, একান্ত আপনার কিছুকে বুকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার থাকার মূল্যবোধ এবং নিজস্ব কায়দায় গড়ে তোলা প্রতিরোধ। জেলের অভ্যন্তরে চরম সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেও তারা রুখে দাঁড়ায়, একে অন্যকে ছুঁয়ে থাকে অদ্ভুত মমতার সঙ্গে। নিদারুণ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আর 'মানবিক সত্তার চরম অবমাননার' বিরুদ্ধে এও এক ধরনের 'পাল্টা ক্ষমতা', 'পাল্টা মূল্যবোধ', আর 'পাল্টা আরেক মতাদর্শের' প্রকাশ। সুজাতরও এই ব্যাপারটা মেনে নিতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। তাহলে 'অজ্ঞাত নকশালপন্থী', বা 'অজানা উগ্রপন্থী' ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় বর্গ ভেঙে তাদের 'রক্তমাংসের রূপ দেওয়া', তাদের পরিচয় প্রকাশ করার পাশাপাশি 'অন্যদের' ওপর চাপিয়ে দেওয়া 'সাধারণ অপরাধী' নামাঙ্কিত সার্বিক বর্গের আচ্ছাদন সরিয়ে তাদের হালহকিকৎ প্রকাশ করাও নিশ্চয়ই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আরেক অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। কেস, ফাইল নম্বরের বদলে উঠে আসবে একের পর এক নানা মানুষের মুখ, তাদের মানবিক জগত এবং তাদের হারিয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বর। আর তা না হলে নাগরিক মননে 'অপরাধ', 'অপরাধী' ইত্যাদি রাষ্ট্রীয়বর্গ সম্পর্কে ধারণা আরও জোরদার হবে, 'সামাজিক সুস্বাস্থ্য' বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর রাষ্ট্রও খানিকটা নিশ্চিন্ত হবে।

সুজাত গুরুত্ব দিয়ে আমার লেখা পড়েছেন, নানা মন্তব্য আর প্রশ্ন করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। নানা প্রশ্ন তোলায় আমিও আমার বক্তব্য কিছুটা খোলসা করে বলার সুযোগ পেলাম। শুভেচ্ছাসহ,

প্রদ্যুম্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-৯

গ্রন্থসূত্র :

১. 'অনীক' প্রবন্ধ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ভোজপুরের কৃষক সংগ্রাম সম্পর্কে গৌতম ভদ্রের প্রবন্ধ।
জেমস স্কট (সম্পাদিত), 'এভরিডে ফর্ম'স অফ পিজান্ট রেজিসট্যান্স ইন সাউথ-ইস্ট এশিয়া', ফ্র্যাঙ্ক ক্যাস, লন্ডন, ১৯৮৬।

২. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০ আগস্ট, ১৯৯২, ১৭ নভেম্বর, ১৯৯২।

৩. নিম্নবর্গের মানুষজনের নিজস্ব পাল্টা মূল্যবোধ সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন বেনেডিক্ট কার্কলিয়েট তাঁর 'এভরিডে রেজিসট্যান্স টু ইনজাস্টিস ইন এ ফিলিপাইনস ভিলেজ' প্রবন্ধে, জেমস স্কট (সম্পাদিত) 'এভরিডে ফর্ম'স··· ।'

৪. আন্তোনিও গ্রামশ্চী 'সিলেকসন্স ফ্রম প্রিজন নোটবুকস,' নিউ ইয়র্ক ১৯৭৮, পৃ. ২৭৩।

৫. আন্তোনিও গ্রামশ্চী, ঐ পৃ. ১২।

৬. জেমস স্কট, 'এভরিডে ফর্ম'স অফ পিজান্ট রেজিসট্যান্স', পূর্বোল্লিখিত পৃ.-পৃ. ৫-৩৫ ;

৭. আন্তোনিও গ্রামশ্চী, পূর্বোল্লিখিত, পৃ.-পৃ. ১৯৮-১৯৯।

৮. আন্তোনিও গ্রামশ্চী, ঐ, পৃ. ২০০।